গোলাম শফিক

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার এবং বইমেলা

বাঙালির প্রাণের বইমেলা শুরু হলো, যদিও এ বছর মেলা নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা ছিল। এর প্রধান কারণগুলো ছিল সদ্যসমাপ্ত জাতীয় নির্বাচন, মাহে রমজান, ফেব্রুয়ারি মাস চলে যাওয়া, শীতের পর বৃষ্টির মৌসুম শুরু হওয়ার আশঙ্কা ও অন্যান্য। ইত্যাকার বাস্তব কারণে প্রকাশকদের অনাগ্রহই এ সময়ে মেলাটি আয়োজনে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশকদের অভিপ্রায় একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় মেলাটি আয়োজিত হলো।

এ মেলার পেছনে রয়েছে একটি জাতীয় এবং জাতিগত আবেগ। একদা যে মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা হয়েছিল, তার প্রতি মমত্ববোধই বইমেলার ক্ষেত্রে প্রলম্বিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে সরদার জয়েন উদ্‌দিনের শিশু গ্রন্থমেলা কিংবা ১৯৭২ সালের চিত্তরঞ্জন সাহার স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদের (বর্তমান মুক্তধারা) বইমেলার পথ ধরে বর্তমানে এটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার ব্যাপ্তি বিশাল। আজকের বইমেলার নাম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' যার আয়োজক বাংলা একাডেমি।

প্রতি বছর বইমেলায় কী সব বই প্রকাশিত হচ্ছে, এ প্রশ্নটি বারবারই সামনে আসে। দেখা যায় গড়পড়তা মানের বই-ই সংখ্যায় অধিক, তার মধ্যে নিম্নমানের বইও প্রচুর। এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ধরা যায়, মান নিয়ন্ত্রণের মোট তিনটি পক্ষ—লেখক, প্রকাশক ও আয়োজক বাংলা একাডেমি। দীর্ঘ ৪৩ বছরে বইমেলার যে ভাবমূর্তি গড়ে ওঠার কথা, তা না হয়ে তিনটি পক্ষেরই ব্যর্থতার কারণে সেটি হয়ে উঠেছে বাণিজ্যিক ভাবমূর্তি। প্রতি বছর কোটি টাকার উর্ধ্বে বই বিক্রি হয়। মেলার আগে, এমনকি মেলা চলাকালীন যে কেউ প্রকাশকদের অর্থকড়ি দিয়ে বই প্রকাশ করে ফেলতে পারেন। কেউ কেউ বিজ্ঞাপনের জোরে দেদার বই বিক্রিও করে ফেলেন, বইটি পণ্যগত যোগ্যতা অর্জন করলেও এটির অন্তর্নিহিত মূল্য বা মান কেমন, তার কোনো ফিডব্যাক পাওয়া যায় না। বইমেলা নামের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের এই যে বিশাল হাট, তা নিয়ে সামান্য কিছু তো বলতেই হয়।

মান নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটির দিকে আদৌ নজর দেওয়া হয় না। যেহেতু এজন্য নির্দিষ্ট কোনো পক্ষ নেই, তাই প্রকাশককেই কষ্ট করে ও প্রয়োজনে দু'পয়সা খরচ করে কাজটি করতে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, প্রকাশকরা এ দায়িত্ব পালন তো করেনই না, এমনকি কোনো কোনো প্রকাশনা সংস্থা প্রুফ দেখার দায়িত্বও স্কন্ধে চাপাতে চায় না। বই প্রকাশের আগে সাধারণত লেখক-প্রকাশকের মধ্যে যে কথা হয়, সেসব মোটা দাগে হচ্ছে— প্রকাশক বলেন, আপনি এত টাকা দেবেন কিংবা ২০০-৩০০ কপি বই কিনে নেবেন। এজন্য প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার পর করুণ রসিকতা করে কোনো কোনো লেখক বলতে পারেন, আমার বই ২০০ বা ৩০০ কপি বিক্রি হয়ে গেছে। এ ডিলিং—এসব সময়ই অস্পষ্টতা বিরাজমান থাকে, যেমন—কত কপি

বই মুদ্রিত হবে, সে বিষয়ে কোনো কথা হয় না, যেহেতু কোনো চুক্তিপত্রই সম্পাদিত হয় না। কখনো লেখক যদি বলেন, ঠিক আছে— রয়েলটি দেবেন তো, তখন প্রকাশক বলেন, বই বিক্রি হলে অবশ্যই পাবেন। কিন্তু বই বিক্রি হলো কী হলো না, তার কোনো হদিস থাকে না। উপরন্তু প্রকাশকরা সবসময়ই শুনিয়ে থাকেন, তারা ক্রমাগত লোকসান দিয়েই মেলা চালান। মেলায় কারও কারও লোকসান যে হয় না, তা নয়। তবে জাঁকজমকপূর্ণ স্টল বহালতবিয়তে চালিয়ে যাওয়া এবং তাদের গলা টেনে কথা বলার মধ্যে এক ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়।

বই আর পাঁচটি পণ্যের মতো নয়, যার ব্যবহারিক মূল্যই প্রধান, এর প্রকৃত মূল্য ব্যবহারিক মূল্যেরও অধিক। এটি বড় ধরনের এক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। যে কোনো সম্পদ এবং শ্রমেরই একটি পণ্যমূল্য আছে। সেই মূল্য পরিশোধের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় না বলে বাংলাদেশে লেখক-শিল্পীরা শোষিত হচ্ছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্র আমাদের ভিন্ন ধারণা দেয়। কোরিয়াতে শিশুরা খেলার ছলে যে ছবি আঁকে, তার জন্যও তারা একটি সম্মানি পেয়ে থাকে। আমেরিকার মতো দেশে পিতার দোকানে কোনো সন্তান দু'চার ঘণ্টার জন্য বসলে, সে পিতার কাছ থেকে একটি মজুরি হিসাবেই দিচ্ছি। আমাদের দেশে গৃহিণীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদও থাকে) তেমনিভা স্বীকৃতিদানে কোনো কর্তৃপক্ষেরই কোনো গর চুক্তি সম্পাদন বা স্বাক্ষরের বিষয়টি উল্লেখ দাবি রাখে। বই প্রকাশের আগে লেখক আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সচেতন অধিকারের সুরক্ষা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণ চমকে ওঠা সব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। জনপ্রিয় লেখকও কোনো চুক্তি সম্পাদন কর বা পরবর্তী সময়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অব সম্পাদনের ব্যাপক অনুপস্থিতি, সে বিষয়ে যায় না। একমাত্র বাংলা একাডেমিই আয়োজ পারে।

এ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের হাট-বাজারে আরে হচ্ছে, বিভিন্ন বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। অনুমতি পাইরেটেড অ্যাডিশন বা চোরা সংস্করণ। ঘটে। নীতিমালার অভাব বা তা প্রয়োগে দু আইন অনুযায়ী লেখকের মৃত্যুর ৬০ বছর কনটেন্ট পুনর্মুদ্রণ করা যায়। কিন্তু এটা কি বছর ২০০১ সালের আগে তার কোনো গ্র রেপ্রোগ্রাফিক রাইট বা পুনর্মুদ্রণের অধিক আমাদের দেশে রেপ্রোগ্রাফিক রাইটসংক্রা লেখকরা যেমন বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি স রাজস্ব থেকে।

মেধাস্বত্ব থেকে সম্মানী অর্জনে লেখকরা তাদের কেউ কেউ বই প্রকাশ করতে পার বিনিয়োগ না করেই কার্যক্রম চালানো সম্ভব জন্যই এ মেলা ফল বয়ে আনেনি।

এতে রয়েছে চতুর্মুখী আবেগ—ভাষা আন্দে করে বুদ্ধিজীবী হওয়ার আবেগ ও আত্মতৃ থাকার প্রকাশকদের আবেগ, আর যা-ই হে গিয়ে আমি এখানে এলাম। এসব আবেগের করে বিবেকের উচ্ছ্বাসে রূপান্তর করা একান্ত

ড. গোলাম শফিক : *কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধি*